ধর্মে বাড়াবাড়ি
(দ্বীন মেঁ গুলূ)

মূল : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান
সাবেক প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
মদীনা মুনাওয়ারাহ, সঊদী আরব

অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বি.এ. (অনার্স), এম.এ. (রাজ.), পিএইচ.ডি.(রাজ.)

ধর্মে বাড়াবাড়ি

মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্রকাশক : মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, রবীউল আখির ১৪৩১ হিজরী। কম্পোজ ও বর্ণ বিন্যাস : আল-ইসলাম কম্পিউটার্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মুদ্রণ : দি বৈশাখী প্রিন্টিং প্রেস, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। মূল্য : ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

DHARME BARABARI (DEEN ME GULU)

Writen by Mawlana Abdul Gaffar Hasan, Translated by Dr. Muhammad Kabirul Islam. Published by Muhammad Jahidul Islam. Printing : The Bayshakhi Printing Press, Gorhanga, Rajshahi. 1st edition : April 2010 AD. Price: Tk. 25/= Only.

ISBN: 978-984-33-1565-6

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে ‘দ্বীন মেঁ গুলূ’-এর বঙ্গানুবাদ ‘ধর্মে বাড়াবাড়ি’ শিরোনামে প্রকাশিত হলো। ফালিল্লাহিল হামদ। প্রখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান বইটির মূল লেখক। ব্যাপক চাহিদার কারণে কয়েকবার বইটি মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিবার এর সব সংখ্যা নিঃশেষ হয়েছে। বইটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সবার জন্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন তিনি। পাঠকের সুবিধার্থে কুরআনের আয়াত ও হাদীছের তথ্যসূত্র উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। পাশাপাশি লেখক সম্পর্কে পাঠক মহলকে অবহিত করতে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন। বইটি বিজ্ঞ পাঠক সমাজের নিকট গ্রহণীয় ও সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ যেন তাদের উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। সচেতন পাঠকদের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

বিনীত
প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ। এখানে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের কোন স্থান নেই। আল্লাহ বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। তাই মানব জীবনে বাড়াবাড়ি ইসলামে পছন্দনীয় নয়। সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক, আক্বীদার ক্ষেত্রে হোক কিংবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন বাড়বাড়ি কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ অধিক তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা অর্জনের লক্ষ্যে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা চালাতে চায়। এটা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'আমি যখন তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী প্রতিপালন কর' *(বুখারী, 'কিতাবুল ই'তিছাম' হা/৭২৮৮)*।

সুতরাং আমলে-আখলাকে, ইবাদত-বন্দেগীতে, চাল-চলনে সর্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করে সাধ্যমত মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করতে হবে। সাধ্যের বাইরে নফল ইবাদত করতে গিয়ে মানুষ এক সময় ফরয প্রতিপালনে অপারগ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে সামর্থ্যের অতিরিক্ত দান-ছাদাক্বা করতে গিয়ে মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে জীবন ধারণের জন্য অপমানজনক পথ অবলম্বন করতে হয়। যেটা মোটেই কাম্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا 'কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না' *(বাক্বারাহ ২/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তাই মানুষকে সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করতে হবে। আলোচ্য পুস্তিকায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। এজন্য বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত রাখতে এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান যথাযথ পালনের দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বইটির অনুবাদ করতে মনঃস্থ করি। বইটি পাঠকের উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আর এর উত্তম প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-অনুবাদক

ভূমিকা

'দ্বীন মেঁ গুলূ' অর্থাৎ ধর্মে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন। জ্ঞানের দ্বীপ্তি বিচ্ছুরণকারী এই আলোচনা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল গাফফার হাসান 'রিবাতুল উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ' আয়োজিত এক সমাবেশে উপস্থাপন করেন। তিনি কুরআন ও হাদীছের আলোকে তথ্য বহুল আলোচনা পেশ করেন, যা মানুষকে দ্বীনে হক্বের উপরে কায়েম ও দায়েম থাকতে যারপর নেই সহযোগিতা করবে। মানুষ যাতে অতি পরহেযগার ও অতি বড় ইবাদতগুযার হতে গিয়ে নিজের প্রতি যুলুম না করে এবং ধর্মীয় কাজে সীমালংঘন না করে সে বিষয়ে যথাযথ দিকনির্দেশনা পেশ করা হয়েছে এতে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামসহ মনীষীগণের উক্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে আলোচনা হয়েছে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। একারণে মাওলানা আব্দুল গাফফারের অনুমতিক্রমে বৃহত্তর স্বার্থে رباط العلوم الإسلامية (রিবাতুল উলূম আল-ইসলামিয়া) এটি প্রকাশ করে। বইটির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে একাধিকবার (১৪০৩ হি., ১৪১০ হি. ও ১৯৯৩ খ্রী.) প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পাঠে সর্ব সাধারণ উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন-আমীন!

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আব্দুল গাফফার হাসান ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইলম শিক্ষা দান ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে যেসকল আহলেহাদীছ বিদ্বান দাওয়াত-তাবলীগ, গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থ সংকলনের কাজ করেছেন তন্মধ্যে মুযাফফর নগরের অন্তর্গত ওমরপুরের ওমরী বংশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনবসতি ও আয়তন উভয় দিক দিয়ে ওমরপুর একটি ছোট্ট পল্লী। এই পল্লীর বুক চিরে বের হয়েছে জগদ্বিখ্যাত ও যুগশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বহু ব্যক্তিত্ব। আর তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। মাওলানা আবদুর রহমান মুঈনুদ্দীন ওমরপুরী, মাওলানা ওবায়দুর রহমান ওমরপুরী, মাওলানা আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী এবং মাওলানা আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী ছিলেন এ গ্রামের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র স্বরূপ। মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানও ছিলেন এ গ্রামের ও উক্ত বংশের মর্যাদাসম্পন্ন এক সূর্য সন্তান ও আলেমে দ্বীন।

জন্ম ও শৈশব : আব্দুল গাফফার হাসান দিল্লীর নিকটবর্তী রুহতাক শহরে ১৯১৩ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুস সাত্তার (মৃত্যু ১৯১৬ খ্রী.) এবং দাদার নাম মাওলানা আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী (মৃত্যু ১৩৩৪হি./১৯১৬ খ্রী.)। ১৯১৬ সাল ওমরপুরী বংশের জন্য অত্যন্ত দুঃখ-বেদনা ও বিপদ-মুছীবতের বছর ছিল। এ বছর এ বংশের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল জাব্বার ইন্তিকাল করেন এবং এর এক মাস পরে তাঁর ছেলে আব্দুস সাত্তার ও তাঁর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। একই বছরে আব্দুল গাফফার দাদা ও পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হন। এ বছর তার ছোট ভাই আব্দুল কাহ্হারও মৃত্যুবরণ করে। পিতৃ-মাতৃহীন আব্দুল গাফফার স্বীয় দাদীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।

শিক্ষাজীবন : শৈশবকালে তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে দাদীর মৃত্যুর পরে আব্দুল গাফফার দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য দিল্লীর কিশানগঞ্জস্থ 'মাদরাসাতুল হুদা'য় ভর্তি হন। এখানে তার দাদা মাওলানা আব্দুল জাব্বার ও পিতা আব্দুস সাত্তার দারস-তাদরীস ও ছাত্রদের মাঝে ইলমী সুধা বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন। এ মাদরাসায় প্রাথমিক পুস্তকাদি অধ্যয়নের পরে তিনি কলকাতার 'দারুল হাদীছ মাদরাসা'য় চলে যান। সেখানে শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণের নিকট থেকে ইলম হাছিলের পর দিল্লীর 'জামি'আ রহমানিয়া'তে চলে যান। এখানে তখন জগদ্বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে দ্বীন উঁচু মানের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুল গাফফার হাসান ঐ প্রখ্যাত শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থেকে ইলম হাছিলের মাধ্যমে স্বীয়

জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে নেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দারসে নিযামিয়ার শিক্ষা সমাপ্ত করে সনদ লাভ করেন। দারসে নিযামী শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৯৩৫ সালে লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ফাযিল ডিগ্রী এবং ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ফাযিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষকবৃন্দ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান যাঁদের নিকট থেকে ইলমের অমীয় সুধা পান করে জ্ঞানের বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ১. মাওলানা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী, ২. মিশকাতুল মাছাবীহের বিশ্বখ্যাত ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচয়িতা শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, ৩. মাওলানা নাযীর আহমাদ আ'যামী, ৪. মাওলানা মুহাম্মাদ সুরতী, ৫. তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণেতা মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ৬. মাওলানা ফযলুর রহমান গাযীপুরী. ৭. মাওলানা ওমর ইসলাম আফগানী, ৮. মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ জলন্ধরী হানাফী, ৯. মাওলানা সিকান্দার আলী হাযারুবী হানাফী, ১০. মাওলানা শরীফুল্লাহ খাঁ সুরতী প্রমুখ *(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলেহাদীছ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২; তাযকিরাতুল জালা ফী তারাজিমিল ওলামা আল-ইরাকী, পৃ. ৮০)*।

কর্মজীবন : দারসে নিযামী শিক্ষা সমাপনের পরে তিনি মূলতঃ দারস-তাদরীস তথা পাঠদান ও শিক্ষা প্রদানের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কিছু দিন তিনি দিল্লীর 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'তে পাঠদান করেন। এরপর ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত 'মাদরাসা রহমানিয়া বেনারসে' তাফসীর, হাদীছ, আরবী সাহিত্যসহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তারপর ১৯৪২ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৪৮ সালের মে মাস পর্যন্ত পশ্চিম পাঞ্জাবের মালির কোটলায় নিজ প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা কাওছারুল উলূমে' দারস-তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান চলে যান। ঐ বছরের জুন মাস থেকে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত লাহোর, সিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফায়ছালাবাদ, সাহওয়াল ও করাচীতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দাওয়াত-তাবলীগ, ফৎওয়া প্রদান প্রভৃতি কাজ অব্যাহত রাখেন। এরপর ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। সেখানে তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর হাদীছ, উলূমুল হাদীছ ও ইসলামী আক্বীদা বিষয়ে পাঠদান করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ফায়ছালাবাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছহীহ বুখারীর দারস অব্যাহত রাখেন *(মাসিক ছিরাতে মুস্তাকীম, করাচী, জানুয়ারী ১৯৯৫)*।

ছাত্রবৃন্দ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় যাবৎ দারস-তাদরীস তথা শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এ সময়ে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভে ধন্য হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ১. করাচীস্থ জামি'আ সাত্তারিয়ার অধ্যক্ষ হাফিয মুহাম্মাদ সালাফী, ২. লাহোরস্থ জামি'আ রহমানিয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা হাফিয আব্দুর রহমান মাদানী, ৩. অনলবর্ষী আহলেহাদীছ বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, ৪. শায়খুল হাদীছ হাফিয মাসঊদ আলম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সিয়ালকোটী, ৬. করাচীস্থ জামিয়া সাত্তারিয়ার শিক্ষক মুফতী মুহাম্মাদ ইদরীস সালাফী, ৭. হাফিয মাওলানা আহমাদুল্লাহ বাড্ডীমালুবী, ৮. মাওলানা আব্দুল গফূর মুলতানী, ৯. হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস সালাফী ইবনু মুফতী আব্দুল কাহ্হার সালাফী, ১০. করাচীস্থ জামিয়া সাত্তারিয়ার শিক্ষক হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ আনাস মাদানী, ১১. মারকাযুল হারামাইন আল-ইসলামী ও অনলাইন ফৎওয়া, ফায়ছালাবাদের পরিচালক মিয়া সাঈদ ইকবাল তাহের, ১২. ভারতের মাওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী দেহলভী, ১৩. ফায়ছালাবাদ থেকে প্রকাশিত 'ইলম ও আমল' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা হাকীম খালিদ আশরাফ, ১৪. ড. মাওলানা ছুহাইব হাসান, ১৫. মাওলানা সুহাইল হাসান, ১৬. মাওলানা রাগিব হাসান, ১৭. ড. আরিফ শাহযাদ (ফায়ছালাবাদ) প্রমুখ।

সাংগঠনিক জীবন : ১৯৪১ সালের ২৫-২৬ আগষ্ট জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা অধিবেশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান মালির কোটলা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি। তবে তিনি মওদূদী সাহেবকে পত্র লিখলেন যে, 'আমার আসা সমস্যা। কিন্তু আমি আপনার সাথে আছি। আমাকেও ঐ সংগঠনে শামিল করে নিবেন'। এভাবে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান জামায়াতে ইসলামীতে অন্তর্ভুক্ত হলেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে গিয়ে মওদূদী সাহেবের 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। ফলে তিনি জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে বিবেচিত হতেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান চলে আসেন। ঐ বছর মওদূদী ও মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ কারারুদ্ধ হলে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান নায়েবে আমীর (ভারপ্রাপ্ত আমীর) নিযুক্ত হন। এরপরও দু'বার তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। ১৯৫১ সালে জামায়াতে ইসলামী যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তখন তিনি জামায়াতের নতুন পলিসির জোর প্রতিবাদ করেন। আরো ১২ জন শীর্ষ বিদ্বান একই মতের উপর ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর

১৬ বছরের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পৃথক হয়ে যান এবং জামায়াতে শামিল হওয়ার পূর্বে তিনি যে ইসলামী কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেদিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : তিনি জামায়াতে ইসলামী থেকে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে, প্রবল আগ্রহ নিয়ে দারস-তাদরীসের কাজ শুরু করেন। এটাই ছিল তাঁর মূল স্থান। তাঁর সাথে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফও জামায়াত থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের সাথে একত্র হয়ে ১৯৫৭ সালে ফায়ছালাবাদের জিন্নাহ কলোনী এলাকায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল গাফফার হাসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসক ছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ছিলেন শু'আইব হাসান ও ড. ছুহাইব হাসান (আব্দুল গাফফার হাসানের দুই ছেলে), শায়খ আব্দুল মাজীদ, শায়খ আব্দুর রহমান, শায়খ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক (এ তিন জন মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফের ভাই)।

আহলেহাদীছ আদর্শের উপর অটল থাকা : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান স্বীয় মাসলাক তথা মতাদর্শের দৃঢ়চিত্ত এবং চিন্তাশীল মুহাদ্দিছ ও প্রচারক ছিলেন। সর্বদা তিনি এ মাসলাককে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। সুন্নাতকে তিনি শুধু প্রচারই করেননি; বরং তিনি সুন্নাতের অতীব পাবন্দ ছিলেন। 'ছিরাতে মুস্তাকীম' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়্যেদ আমির নাজীবুল্লাহ সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রশ্ন করেন যে, জামায়াতে ইসলামীতে থাকাকালে আপনি আহলেহাদীছ মতাদর্শের উপরে অটল ছিলেন কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, জামায়াতে থাকাকালে আমি আহলেহাদীছ আদর্শের উপরেই ছিলাম। কোন কোন সময় নাঈম ছিদ্দীকীর সাথে বিতর্ক বেধে যেত। একদা তিনি বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন ছেড়ে দিন, অসুবিধা কি? আমি বললাম, দাড়ি বড় করেন না কেন? দাড়ি কেটে নিজেই সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করছেন, আবার আমাকে বলছেন রাফ'উল ইয়াদাইন না করার জন্য?

অনুরূপভাবে নাঈম ছিদ্দীকী শৈথিল্যবাদ (مسلك اعتدال) সম্পর্কে কর্মীদেরকে শিক্ষাদানের প্রস্তাব দিলে আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম। আমি বললাম, এখানে আহলেহাদীছ ও হানাফী লোক আছে। আর শৈথিল্যবাদ কেবল মওদূদীর নিজস্ব দর্শন। আমরা এটা পছন্দ করি না। এজন্য এই মতাদর্শের প্রচার এখানে অসম্ভব। আমি হাদীছ বিরোধী কোন শাখারূপ মাসআলাকেও মানি না। এমনকি আমি জামায়াতে ইসলামীর প্রশিক্ষণস্থলে ঘোষণা দিতাম যে, আমরা শৈথিল্যবাদকে মানি না। অনেক বাক-বিতণ্ডা, অনেক বিরোধিতা ও অনেক কিছু সহ্য করে আমি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রে থেকেও

আহলেহাদীছ আদর্শে অটল ছিলাম *(ছিরাতে মুস্তাকীম, জুন ১৯৯৫)*। উল্লেখ্য, শৈথিল্যবাদ (مسلك اعتـــدال) মওদূদীর নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তারধারা, ই'তেদাল তথা ন্যায়নীতির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

শিক্ষা পরিষদ গঠন : ফায়ছালাবাদ অবস্থানকালীন সময়ে ১৯৮৯ সালের দিকে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও হাদীছ বিশারদগণের সমন্বয়ে একটি শিক্ষা পরিষদ গঠন করেন। জামি'আ তা'লীমাতে ইসলামিয়া, ইদারায়ে উলূমিল আছরিয়া, কুল্লিয়া দারুল কুরআন ওয়াল হাদীছ (জিন্নাহ কলোনী), জামি'আ সালাফিয়া এবং জামি'আ তা'লীমুল ইসলাম (মামু কাঞ্জন) প্রভৃতি স্থানে এ পরিষদের অধিবেশন হতো। যেখানে সমসাময়িক মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হতো।

সরকারী দায়িত্ব পালন : জেনারেল যিয়াউল হক্বের শাসনামলে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। ৯ বৎসর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও জাতির খেদমত করেন। অতঃপর বেনযীর ভুট্টোর শাসনামলে তিনি পদচ্যুত হন। কেননা তিনি নারী নেতৃত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বক্তৃতা : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান যেমন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন তেমনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও খ্যাতিমান ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি ধীর-স্থিরভাবে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করতেন। অত্যন্ত জটিল-কঠিন বিষয়ও অতি সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নিতেন।

রচনাবলী : লেখালেখিতেও মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ছিলেন অমূল্য রত্ন সদৃশ। যদিও শিক্ষাদান ও পাঠদানে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিকে অধিক মনোযোগ দিতে পারেননি, তথাপি তাঁর খুরধার কলম থেকে অমূল্য কতিপয় গ্রন্থ ও ছোট ছোট কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা বের হয়েছে। যেগুলো অধ্যয়ন করলে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য, শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ইলমী দক্ষতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ হবে। তাঁর লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে- ১. আযমাতে হাদীছ (عظمـــت حـــديث), ২. ইন্তিখাবে হাদীছ (انتخاب حديث), ৩. মি'য়ারে খাতুন (معيار خاتون), ৪. দ্বীন মেঁ গুলূ (دين مين غلـــو) প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ২০টি প্রবন্ধ লিখেছেন। আহলেহাদীছ আলেমগণের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর লিখিত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ১টি প্রবন্ধ লাহোরের 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় ১৯৯৪ সালে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। যাতে অনেক বিরল বিষয় সংযুক্ত ছিল। উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও 'হাক্বীক্বাতে দো'আ' (حقيقت دعا) ও 'হাক্বীক্বাতে রামাযান' (حقيقت رمضان) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কয়েকটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

কারাবরণ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি দারস-তাদরীস, গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনের মাধ্যমে রাসূলের হাদীছের সীমাহীন খেদমত করেছেন। ১৯৫৩ সালে খতমে নবুওয়াত আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ফলে তাঁকে ১১ মাস কারান্তরীণ রাখা হয়। এর মধ্যে ১ মাস সিয়ালকোটে এবং ১০ মাস মুলতানের কারাগারে অতিবাহিত করেন।

আখলাক বা চরিত্র : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান হাসি-খুশি মেযাজের, নম্র প্রকৃতির মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু মানুষ ছিলেন। ইলম ও আমলে, সম্মান ও মর্যাদায় তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ তথা ইনসানে কামেল। তিনি ইসলামী বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং এসব বিষয়ে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মধ্যম আকৃতির আনত দেহের, উজ্জ্বল চেহারা, প্রশস্ত কপাল, উদ্ভাসিত আঁখি ও পাতলা স্বল্প শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে পথ চলতেন। তিনি শুভ্র-সাদা পোশাক পরিধান করতেন।

মৃত্যু : ২০০৭ সালের ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ১১-টায় ৯৪ বছর বয়সে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ইন্তিকাল করেন। পর দিন সকাল ১০-টায় তাঁর পুত্র ছুহাইব হাসানের ইমামতিতে তাঁর জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে ইসলামাবাদে দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততি : তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে ৭ ছেলে ও ১ মেয়ে। যারা সবাই দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যথাসাধ্য দ্বীনের প্রচার-প্রসারে রত আছেন। তাঁর ছেলেদের নাম হচ্ছে-১. শু'আইব হাসান, সঊদী এয়ারলাইন্সের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ২. ড. ছুহাইব হাসান, বৃটেনে দাওয়াত-তাবলীগে নিয়োজিত। ৩. ড. সুহাইল হাসান, ইসলামাবাদে কর্মরত। ৪. আহমাদ হাসান, ইসলামাদে আরবীয় অফিসে কর্মরত। ৫. ড. রাগিব হাসান, রাবিতা আলাম আল-ইসলামীর ইসলামাবাদ অফিসে কর্মরত। ৬. ড. খুবাইব হাসান, আশ-শিফা ইন্টারন্যাশনাল-এর ডাইরেক্টর। ৭. হামিদ হাসান, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর *(পাক্ষিক তরজুমান, ২৭তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, জুন ২০০৭)*।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনো বাক্যে দো'আ করি আল্লাহ যেন মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন-আমীন!

গুলূর পরিচয় ও প্রকারভেদ

আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْرًا وَضَلُّواْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

আজকের দরসে কুরআনের বিষয় হচ্ছে ইসলাম বা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার পরিণতি বা পরিণাম কি? তার স্তর কি? তার স্থান ও হুকুম কি?

ইফরাত (إفراط) বা বাড়াবাড়ির অপর নাম হচ্ছে غلو (গুলূ)। غلو (গুলূ)-এর অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন ও সীমাতিক্রম করা। যেমন কোন বস্তুর ওযন যদি এক পোয়া পরিমাণ হয়, তাহলে তাকে এক সের সমান অভিহিত করা গুলূর এক প্রকার। অথবা শরী'আতের কোন মুস্তাহাব অর্থাৎ পছন্দনীয় কাজকে ফরয ও ওয়াজিবের মর্যাদা প্রদান করাও এক প্রকার গুলূ বা বাড়াবাড়ি। কিংবা কোন হালাল বস্তুকে দ্বীনদারী, ধর্মভীরুতা ও আল্লাহভীতির উদ্দেশ্যে নিজের উপর হারাম করাও গুলূ তথা সীমালংঘন। মোটকথা কোন জিনিস বা কোন কথাকে তার যথোপযুক্ত সীমা থেকে বৃদ্ধি করে দেওয়াই গুলূ তথা বাড়াবাড়ি। মানব জীবনের দৃষ্টিতে গুলূ প্রধানতঃ দুই প্রকার।

প্রথমতঃ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ও দ্বীনদারী বা ধার্মিকতায় গুলূ : এটা হচ্ছে গুলূর এমন এক প্রকার যা আল্লাহভীতি বা পরহেযগারিতা ও ধর্মভীরুতা বা দ্বীনদারীর নামে হয়ে থাকে। কতিপয় হাদীছে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে যে, তাক্বওয়া, ধর্মভীরুতা ও আধ্যাত্মিকতা লাভের ক্ষেত্রে গুলূ বা সীমালংঘন কিভাবে সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে উদাহরণ সামনে পেশ করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিত্বে গুলূ বা বাড়াবাড়ি : ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে দ্বীনের খেদমতের ব্যাপারে যাদের সুস্পষ্ট অবদান রয়েছে, তাদের মর্যাদার সীমা অতিক্রম করা বা বাড়িয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে غلو في الشخصيات বা ব্যক্তিত্বে বাড়াবাড়ি। অন্যভাবে একে

ব্যক্তিপূজাও বলা যায়। মূলতঃ আল্লাহ্র ইবাদত-উপাসনার স্থলে ব্যক্তিপূজাই হচ্ছে غلو في الشخصيات বা ব্যক্তিত্বে বাড়াবাড়ি।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে আল্লাহভীতি, দ্বীনদারী ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কিংবা ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মানুষ গুলূ তথা সীমালংঘন করুক উভয়ই শরী'আতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে গুলূ বিস্তৃত। উদাহরণ স্বরূপ আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিকসহ সকল ক্ষেত্রেই সীমালংঘন করা যায় ও করা হয়। এদিক থেকে গুলূ এমন একটি ব্যাপক বিষয় যা এক বৈঠকে আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবুও আমরা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

غلو (গুলূ) আরবী শব্দ, যা غَلاَ يَغْلُو (গালা ইয়াগলূ) থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। এর আরেকটি ক্রিয়ামূল হচ্ছে غَلاَءٌ (গালাউন), যার অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাওয়া বা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সৃষ্টি হওয়া। যেমন বলা হয়, غَلا السِّعْرُ (গালাস সা'রু) অর্থ- দাম চড়া হয়েছে। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি লোক চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ধর্মের মধ্যে সীমালংঘন (غلو) হয়ে গেলে কেউ পরোয়া করে না, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এটা এজন্য হয় যে, অন্তরে দ্বীনের কোন গুরুত্ব নেই, যদিও উভয় কাজ মূলতঃ একই। غلا (গালা)-এর ক্রিয়ামূল হচ্ছে দু'টি। ১. غَلاَءٌ (গালাউন) যার অর্থ- মূল্যবৃদ্ধি। ২. غُلُوٌّ (গুলূ) যার অর্থ হচ্ছে কারো সম্মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্ভ্রমে যতটুকু প্রযোজ্য তার চেয়ে বৃদ্ধি করে দেয়া। আরেকটি ক্রিয়া হচ্ছে غَلَى يَغْلِيْ غَلْيَانًا থেকে নির্গত। যার অর্থ হচ্ছে পাতিল তপ্ত হওয়া। যেমন غَلَتِ الْقِدْرُ অর্থ- হাড়ীর মধ্যে ফুটন্ত অবস্থা হয়েছে। মানুষ যখন অত্যন্ত ক্রোধে ফেটে পড়ে তখন বলা হয়, قَدْ غَلَى غَضَبُهُ غَلْيَانًا অর্থাৎ 'তার ক্রোধ সীমা অতিক্রম করেছে'। সে রাগে এমনভাবে ফুসতে থাকে যেভাবে আগুনের উপর রাখা পাতিলের ঢাকনা খুলে যায়, উন্মুক্ত ও অনাবৃত্ত হয়ে যায়। মোদ্দাকথা আভিধানিক দিক দিয়ে غُلُوّ (গুলূ) শব্দটি সীমাতিক্রম ও সীমালংঘনের অর্থে আসে, চাই এ সীমালংঘন সম্মান-ইয্যতের ক্ষেত্রে হোক বা অপমান-অপদস্ত ও অবজ্ঞার ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হোক।

আলোচ্য সূচীতে উল্লিখিত إِفْـــرَاط وَ تَفْـــرِيْط শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও এখানে আবশ্যিক। إِفْرَاط শব্দটি غلو (গুলূ) শব্দের সমার্থক। অর্থাৎ أَفْرَطَ يُفْرِطُ إِفْرَاطًا-এর অর্থও হচ্ছে সীমালংঘন, সীমা অতিক্রম ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًــا 'আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা' *(কাহফ ১৮/২৮)*। মূসা ও হারূন (আঃ)-কে আল্লাহ যখন ফিরা'আউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তারা বললেন, رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَّطْغَى – 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে' *(ত্বা-হা ২০/৪৫)*।

تَفْـــرِيْطٌ (তাফরীত) অর্থ হচ্ছে হ্রাস করা, কম করা, সংকোচন করা ইত্যাদি। কোন জিনিসের ওযন যদি এক সের পরিমাণ হয়, তাহলে তাকে অর্ধসের বলা হচ্ছে তাফরীত (تَفْرِيْطٌ)। ইফরাত (إِفْـــرَاط) শব্দটি উর্দূ ভাষায়ও কথিত ও ব্যবহৃত হয়। যেমন মুদ্রা বা কাগজের নোট বৃদ্ধি পেলে তাকে إفراط زر (মুদ্রাস্ফীতি) বলা হয়। ইফরাত (إفراط)-এর জন্য তাফরীত (تَفْـــرِيْطٌ) আবশ্যিক। মুদ্রাস্ফীতির কারণে স্বর্ণের পরিমাণে কোথাও সংকোচন (تَفْرِيْطٌ) হয়। আবার সরকারের নিকট যখন স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস পায়, তখন কাগজী মুদ্রা বেড়ে যায়। মোটকথা একদিকে (إِفْـــرَاط) হলে বা বৃদ্ধি পেলে অপরদিকে তাফরীত (تَفْرِيْطٌ) হয়ে যাবে তথা হ্রাস পাবে।

تَفْـــرِيْطٌ (তাফরীত) শব্দটি কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা- ইউসুফ (আঃ) যখন স্বীয় ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন, তখন সৎ ভাইদের মধ্যে যিনি বড় তিনি বললেন, وَمِنْ قَبْلُ مَا فَـــرَّطْتُمْ فِـــيْ يُوْسُـــفَ 'আর পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছ' *(ইউসুফ ১২/৮০)*। তাকে দেখার পর আমার এই সাহস নেই যে, আমি বিনইয়ামীনকে রেখে পিতার সম্মুখে যাব। অন্যত্র এসেছে, مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَـــيْءٍ. 'আমরা এ গ্রন্থে কোন কমতি-স্বল্পতা রাখিনি' *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। অর্থাৎ এ গ্রন্থ পরিপূর্ণ। অন্যত্র আরো এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন পাপীষ্ঠরা বলবে, يَا حَسْرَتَىْ عَلَى مَا فَرَّطْتُّ فِـــيْ جَنْـــبِ اللهِ. 'হায় আফসোস! আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছি' *(যুমার ৩৯/৫৬)*। উল্লিখিত বিভিন্ন

উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইফরাত (إِفْـــرَاط) অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, অতিরঞ্জন। আর تَفْرِيْطٌ (তাফরীত) অর্থ হচ্ছে হ্রাস ও সংকোচন। গুলূ (غلو) ও ইফরাত (إفراط) দু'টিই সমার্থক শব্দ।

তাক্বওয়া বা দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে গুলূ

মানুষ যখন নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করে বা সংকোচন করে তখন তা বাড়াবাড়ির এক প্রকারে রূপান্তরিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কুরআন-হাদীছের বিধান মোতাবেক চলে ততক্ষণ সে ছিরাতুল মুস্তাকীম (সরল-সোজা রাস্তা)-এর উপর অবিচল থাকে এবং সংযোজন-বিয়োজন বা হ্রাস-বৃদ্ধি (افـــراط و تَفْـــرِيْطٌ)-থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যখন শরী'আতের প্রান্ত পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি বা পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে, তখন সে দ্বীনের মাঝে সংযোজনও করতে থাকে। অতঃপর আস্তে আস্তে উক্ত সংযোজিত বিষয়ই দ্বীনের মূলে পরিণত হয় এবং আসল দ্বীনের কিনারা হাত থেকে বেরিয়ে যায়। যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনাদের আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْـــلُ. 'আর তোমরা ঐসব লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*। উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের নাছরাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কওম বলতে ঐ সম্প্রদায়, তাদের সঙ্গী-সাথী ও মিত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং ত্রিত্ববাদের আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করত। খ্রীষ্টধর্মে প্রবেশের পূর্বে তারা যে গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, সেই গোমরাহীকে খ্রীষ্টবাদের পরিচ্ছদে আবৃত করার চেষ্টা করে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় নাছারাদেরকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ মূল আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলের অনুসরণ কর। আর ইঞ্জীলের অনুসরণ করার অর্থই হচ্ছে কুরআন মাজীদের অনুসরণ। কেননা ইঞ্জীলে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কোন সৎপথ বিচ্যুত ব্যক্তি বা গোত্রের অনুসরণও এক ধরনের গুলূ (সীমালংঘন)। এর ফলে মানুষ সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

আয়াতে যদিও আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে নাছারারা। ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইহুদীদের মধ্যে ইফরাত ও তাফরীত বা হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই বিদ্যমান। তবে তাফরীত বা সীমালংঘনই তাদের মধ্যে বেশী ও সুস্পষ্ট।

পক্ষান্তরে নাছারারা তার ব্যতিক্রম, তাদের মাঝে ইফরাত (সীমালংঘন) সুস্পষ্ট ও ইফরাতের আধিক্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে ইবাদত-উপাসনা, দ্বীনদারী-ধার্মিকতা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে গুলূ (সীমালংঘন) বিদ্যমান। ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে, وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْـنُ اللهِ. 'আর ইহুদীরা বলে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র' *(তওবা ৯/৩০)*। তারা একদিকে ব্যক্তিত্বে গুলূ তথা সীমালংঘন করে এবং আল্লাহ্‌র এক নবীকে তাঁর পুত্র সাব্যস্ত করে। অপরদিকে ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা তাফরীত করে বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। ইহুদীরা তাঁকে একজন সম্মানিত মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে ও মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করে। যা তাফরীত বা সংকীর্ণতার নামান্তর। এজন্য কুরআন মাজীদে ইহুদীদেরকে الْمَغْضُوْبُ عَلَـيْهِمْ (তাদের উপর গযব) বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَـيْهِمْ، 'হে প্রতিপালক! আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে'। الْمَغْضُوْبُ عَلَـيْهِمْ (যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে)-এর প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হলো ইহুদীরা। তার পরে এসেছে, وَلاَ الضَّالِّيْنَ অর্থাৎ আমাদেরকে পথভ্রষ্টদের পথে পরিচালিত কর না। الضَّالِّيْنَ বা পথভ্রষ্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাছারারা।

মূলতঃ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ইফরাত (বাড়াবাড়ি) ও তাফরীত (সংকোচন) কোনটাই কাম্য নয়; বরং উভয়ই অপছন্দনীয়, ঘৃণিত। তাফরীত (সংকোচন) দ্বারা নাফরমানী ও অবাধ্যতা এবং পাপাচার সৃষ্টি হয়। ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্য দ্বারা আল্লাহদ্রোহীতা ও কুফর পয়দা হয়। আর ইফরাত (বাড়াবাড়ি)-এর ফলে শিরক জন্ম নেয়, বিদ'আত প্রসার লাভ করে, যা দূরীভূত করা অতীব কষ্টকর। অনেক লোক জানে যে, মদ্যপান হারাম, তবুও পান করে ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিংবা ভ্রান্ত অভ্যাস বশতঃ। তবে সে মদ্যপানকে ধর্মীয় কাজ মনে করে না, এটাকে ফাসেকী বা পাপাচার বলে মনে করে। কিন্তু মদ্যপান বা মদ তৈরীকে ও তা ব্যবহারকে দ্বীন জ্ঞান করা বিদ'আত; যেরূপ বর্তমানে বিভিন্ন মাযারে করা হয়। এটাকে প্রতিহত করা, দূরীভূত করা দুরূহ। কেননা তারা এটাকে ধর্মের অংশ বা অঙ্গ বানিয়ে নিয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, এই দ্বীনের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা তাদের নিকট মহাঅপরাধ। এজন্য ফিসকের (পাপাচারের) চেয়ে বিদ'আত অত্যধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক। ইফরাত (বাড়াবাড়ি) ও তাফরীত (সংকোচন) উভয়টা থেকেই বিদ'আত জন্ম নেয়। আর এই বিদ'আত বৃদ্ধি পেতে পেতে

শিরকের দিকে ধাবিত হয়। কুরআন মাজীদে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. 'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সত্য বিষয় ছাড়া কোন কথা বল না' *(নিসা ৪/১৭১)*।

কুরআন কারীমের দুই স্থানে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের ধর্মের মধ্যে সীমালংঘন কর না'। প্রথমতঃ সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা মায়েদার ৭৭ নং আয়াতে, উভয় জায়গায় বলা হয়েছে, 'দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি কর না'। ঈসা (আঃ) মরিয়মের পুত্র, তাঁকে প্রভু (আল্লাহ) বানিও না। কেননা এটাই ব্যক্তিত্বে সীমালংঘন। কোন ফক্বীহ বা মুজতাহিদ কিংবা ছাহাবীকে নিষ্পাপ ইমাম গণ্য করা, আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূলকে আল্লাহ্‌র শরীক করা অথবা তাঁকে উপাস্য সাব্যস্ত করা কিংবা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গণ্য করা সীমালংঘন। যে সকল বুযর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তির কেবল সম্মান-ইয্যত প্রাপ্য তাদের ইবাদত-উপাসনা আরম্ভ করা বা অনুরূপ সমস্ত কাজ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সীমালংঘনের শামিল এবং ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সীমালংঘনের ন্যায় তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, দ্বীনদারী-ধার্মিকতা এবং ইবাদত-উপাসনায় সীমালংঘন বা বাড়াবাড়িও শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দীয়। এখানে আমরা কতিপয় হাদীছ উপস্থাপন করব, যার দ্বারা অনুধাবন করা যাবে যে, ইবাদত-উপাসনায় গুলূ বা বাড়াবাড়ি শরী'আতে কতটুকু নিন্দনীয়।

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ هَذِهِ فُلاَنَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِقُوْنَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় তার নিকট এক মহিলা উপবিষ্ট ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ অমুক মহিলা, যিনি অতি ছালাতগুযার (তিনি একজন বড় মুছল্লী, যিনি দিন-রাত নফল ছালাত আদায় করেন, এমনকি রাতেও ঘুমান না)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, থাম, (এ মহিলা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়)। তোমাদের পক্ষে (ফরয ব্যতীত) ঐ পরিমাণ (নফল) ইবাদত করা উচিত, যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ পরিশ্রান্ত হবেন না (অর্থাৎ ইবাদত করতে করতে মানুষ

বৃদ্ধ হয়ে যায়, ক্লান্ত হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। আর তখন সে নিজেই অপারগ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ ছওয়াব প্রদানে অপারগ হন না। তিনি অসীম ছওয়াব প্রদানকারী)। দ্বীনি কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় (নফল) ইবাদত হচ্ছে ঐ ইবাদত, যা ইবাদতকারী অব্যাহত রাখতে পারে’।[১] অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিত নফল ইবাদত করতে পারে। এমন নয় যেমন, কোন ব্যক্তি কিছু দিন অতি দীর্ঘ করে ছালাত আদায় করল, অতঃপর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পরিত্যাগ করল। বরং মানুষের যতটুকু সাধ্য আছে, সেই সাধ্যানুযায়ী সে ইবাদত করবে এবং সে ঐ ইবাদত অব্যাহত রাখবে।

অন্যত্র একটি হাদীছে এসেছে,

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا، فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

২. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের বাড়ীতে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে যখন ঐ সম্পর্কে বলা হলো, তারা তা অপেক্ষা নিজেদের আমল কম মনে করল। তখন তারা বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে আছি? অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কোন দিন ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কোন দিন বিবাহ করব না। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরাই এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি ছিয়াম পালন

১. বুখারী, মুসলিম হা/৭৮৫; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪২, পৃ. ৭৫।

করি আবার ছেড়েও দেই, আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়’।[২]

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যিক। তিনজন ছাহাবীর একজন অঙ্গীকার করল যে, সে দিনে সর্বদা ছিয়াম পালন করবে। দ্বিতীয় জন সারা রাত ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার এবং তৃতীয় জন নারী সংশ্রব পরিহার করে কুমার থাকার শপথ করে। এটা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য (ইফরাত ও তাফরীত), যা থেকে বিদ‘আতের উৎস সৃষ্টি হতে পারে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত গুলূ (বাড়াবাড়ি)-কে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করেন।

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

(٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ.

৩. আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা মসজিদে প্রবেশ করে দু’টি খুঁটির সাথে একটি রশি বাঁধা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দড়ি কিসের? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটা যয়নাবের রশি। যখন ঘুমে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে কিংবা ছালাতে অলসতা আসে, তখন তিনি নিজেকে এ দড়ি দ্বারা বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের সাধ্যমত, সামর্থ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করা উচিত। অতএব কারো যদি ঘুমে আখি মুদে আসে, সে যেন ঘুমায়’।[৩]

এই হাদীছ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামে ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নন্দিত ও পছন্দনীয় নয়; বরং বিদ‘আত। আর বিদ‘আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উহা চিরতরে উৎখাত ও রহিত করতে বর্ণনা করেছেন যে, গুলূ (সীমালংঘন) নাছারাদের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। তারা বৈরাগ্য উদ্ভাবন করেছে, দুনিয়াদারী পরিত্যাগের পদ্ধতি চালু করেছে, পাহাড়-পর্বতে জীবন যাপন, গুহায় প্রবেশ করে উপবেশন ইত্যাদির প্রচলন করেছে। কেউ আবার এমনভাবে হাত প্রসারিত করে দণ্ডায়মান হয় যে, দাঁড়িয়ে থাকতে

২. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত, হা/১৪৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম মুদ্রণ, তা.বি.), হা/১৩১২, ‘ছালাতে তন্দ্রা’ অনুচ্ছেদ, পৃ. ২০৪; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৪৬, ‘ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৬-৭৭।

থাকতে শুকিয়ে জীবনহীন, নির্জীব হয়ে যায় বা জীবনপাত ঘটায়। কেউ বছরের পর বছর এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে বা উপবিষ্ট থাকে। এসবই ইবাদতে গুলূ তথা উপসনায় বাড়াবাড়ির প্রকার। যা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। আমাদের মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞ, মূর্খ, অপদার্থ লোক আছে যারা হিন্দু সন্ন্যাসী, পুরোহিত ও খ্রীষ্টান বৈরাগী পাদ্রীদের দেখাদেখি ইফরাত ও তাফরীত তথা বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যকে পুণ্যজ্ঞান করে। ফলে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বাসস্থান থেকে বেরিয়ে পদব্রজে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করে এবং প্রত্যেক ফার্লং (২২০ গজ) অথবা ১ মাইল অতিক্রম করার পর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে। যেখানেই দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের জন্য থামে, সেখানেই লোকজন জমা হয়ে যায়। তারা বলাবলি করে যে, এ লোক বড় আল্লাহওয়ালা। হজ্জের পবিত্র সফরে বের হয়েছেন এবং অল্প অল্প ব্যবধানে দুই রাকা'আত নফল ছালাত আদায় করছেন। কিন্তু সমবেত লোকজনের জানা নেই যে, ঐ ব্যক্তির নিয়ত কি ছিল। বস্তুতঃ সে খুব বাহ্‌বা পেল এবং প্রীতিমুগ্ধ মুণি-ঋষি হয়ে গেল। কিন্তু তার জানা নেই যে, মনযিলে মাকছূদে (গন্তব্যে) পৌঁছার পথ এটা নয়। তবে হ্যাঁ, তার ইবাদত-বন্দেগী ও ধার্মিকতার সংবাদের চর্চা, জনশ্রুতি হলো এবং সে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হলো। আরেকটি হাদীছে এসেছে,

(٤) عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ رضى الله عنهما قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صـــلى الله عليـــه وسلم فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

(৪) আবু আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তাঁর ছালাত ও খুৎবা ছিল মধ্যম (দীর্ঘও নয়, আবার সংক্ষিপ্তও নয়)।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত ও খুৎবা উভয় ক্ষেত্রে মধ্যম অবস্থা লক্ষ্য রাখতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য দিতে দিতে জনগণের মাঝে বিরক্তি এসে যায় এমন কখনো ঘটাতেন না। বিশেষ করে আমাদের জুম'আর খুৎবা দীর্ঘ হওয়ায় লোকজন মসজিদে এসে আটকে যায়, বন্দী হয়ে পড়ে, লোকজন বসে বসে তন্দ্রায় নুয়ে পড়ে, কিন্তু খুৎবা শেষই হয় না। মসজিদে নববী ও বায়তুল্লাহ্‌তে খুৎবা সর্বাধিক আধঘণ্টা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। মূল কথা হচ্ছে, সাধারণ বক্তৃতা ও আলোচনার মাঝামাঝি হবে জুম'আর

৪. মুসলিম, হা/৮৬৬; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৪৮, 'ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৭।

খুৎবা।[৫] এই পদ্ধতি ছালাতের জামা'আতে অনুসরণ করা উচিত। যাতে জামা'আত অতি দীর্ঘ না হয়, আবার খুব দ্রুত আদায় করতে গিয়ে سُــبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) তিনবার বলার সুযোগ হয় না, এরূপও যেন না হয়। অনুরূপভাবে সিজদার পর সিজদা করতে থাকা যেরূপ মোরগ ঠোকর মারে (তদ্রূপও না হয়)। যেমন হাদীছে একে كَنَقْرِ الــدِّيْكِ (মোরগের ঠোকর মারা) বলা হয়েছে।[৬] এসবই ইবাদতের ক্ষেত্রে শৈথিল্য। আর বাড়াবাড়ি হচ্ছে ইমাম ছাহেব সিজদা এত বিলম্ব করে যাতে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। ফরয ছালাতের জামা'আতে অতিরিক্ত দীর্ঘ ও অস্বাভাবিক লম্বা না করা উচিত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِي فَيَــؤُمُّ قَوْمَــهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَي قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَــانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ لاَ وَاللهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُــوْلَ اللهِ إِنَّــا أَصْحَابَ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذًا فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ، إِقْــرَأْ وَالــشَّمْسِ وَضُحَهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى-

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) মদীনায় নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর (নিজ মহল্লায়) যেতেন এবং মহল্লাবাসীদের ছালাতে ইমামতি করতেন। একদা রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করলেন। তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ছালাতে ইমামতি করলেন এবং তাতে পূর্ণ সূরা বাক্বারাহ পড়া শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে

৫. একটি হাদীছে এসেছে যে, ছালাত হবে মধ্যম এবং খুৎবা হবে মধ্যম। দ্র. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫; জুম'আর খুৎবা দীর্ঘ করা সম্পর্কেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দ্র. মুসলিম, হা/২৮৯২ 'ফিতান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; মির'আত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৬। -*অনুবাদক।*

৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَــاثٍ أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ الِالْتِفَاتِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ وَنَقْــرٍ كَنَقْــرِ الــدِّيكِ মুসনাদে আহমাদ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩১৯, হা/৭২৭৮, হাদীছ হাসান; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০ হা/২২০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪, হা/২৬০; ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১১, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। -*অনুবাদক।*

এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে গেল এবং একাকী ছালাত আদায় করে চলে গেল। এটা দেখে লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও মুনাফিক হইনি। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যাব এবং এসম্পর্কে তাঁকে অবহিত করব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা পানি সেচকারী লোক, সারাদিন সেচের কাজ করে থাকি। এমতাবস্থায় মু'আয আপনার সাথে এশার ছালাত পড়ে স্বীয় গোত্রে এসে সূরা বাক্বারাহ দিয়ে ছালাত শুরু করলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আযের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? তুমি এশার ছালাতে ওয়াশ শামসি ওয়াযুহাহা, ওয়াযযুহা, ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা এবং সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা (বা এর ন্যায় ছোট সূরা) পড়বে'।[৭]

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাক্বওয়া বা আল্লাভীতি, দ্বীনদারী ও ধার্মিকতা বা ইবাদত-বন্দেগীতে গুলূ বা বাড়াবাড়ির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে বলেছেন, ছালাতের মধ্যে এতটুকু পরিমাণ বিলম্ব করা যাতে মানুষ শ্রান্ত, অবসন্ন ও ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়ে এরূপ করা ভুল। তেমনি ছালাতে অতি দ্রুততাও ভুল।

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخي النَّبِيَّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُك؟ قَالَتْ أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا- فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ، فَقَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءَ يَقُوْمُ فَقَالَ سَلْمَانُ نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا، وَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَي النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَدَقَ سَلْمَانُ-

আবু জুহাইফাহ ওয়াহাব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালমান ফারেসী ও আবুদ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) আবুদ দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবুদ দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু দারদা বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে আবুদ দারদা

৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৭৭৫।

এসে সালমান (রাঃ)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে নিয়ে আসলেন। সালমান (রাঃ) তার সাথে আবুদ দারদাকে খেতে বললে তিনি বললেন, আমি ছিয়াম রেখেছি। তখন সালমান (রাঃ) বললেন, 'তুমি না খেলে আমিও খাব না'। (সুতরাং আবুদ দারদাও সালমানের সাথে খেলেন।) রাতে আবুদ দারদা ছালাতের জন্য উঠলে সালমান (রাঃ) বললেন, ঘুমাও। (তিনি ঘুমাতে গেলেন।) রাতের শেষ প্রহরে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, এখন ওঠো। তখন দু'জনে ছালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার উপর পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে এসব বললেন। মহনবী (ছাঃ) বললেন, 'সালমান সত্য বলেছে'।[৮]

আবুদ দারদা (রাঃ) তপস্যা, ধার্মিকতা ও আল্লাহভীরুতায় অতিরঞ্জিত করছিলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কোন প্রশংসিত, পছন্দনীয় ও নন্দিত বিষয় নয়। ফলে সালমান ফারেসী (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে গুলূ তথা বাড়াবাড়ি করা থেকে আবুদ দারদাকে ফিরিয়ে আনেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও সালমান (রাঃ)-এর কাজের প্রশংসা করেন। ইসলামে এমন কাজ পছন্দনীয় নয় যে, কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে তাবলীগের জন্য বের হয়ে যাবে এবং পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির অবস্থা সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর রাখবে না কিংবা দিন-রাত মুছল্লা (ছালাত আদায়ের পাটি)-এর উপর বসে বসে নফল ছালাত আদায় করতে থাকবে আর গৃহে খাদ্যদ্রব্য আছে কি-না তার কোন খোঁজ-খবর রাখবে না। বরং ইসলাম সদা-সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। যে সমস্ত ছাহাবী পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে সারাদিন ছিয়াম পালন করে এবং সারা রাত ইবাদত করতে থাকে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিদের্শ দিয়েছেন যে, তোমরা এরূপ কর না। তোমাদের স্ত্রী-সন্তানের হক আছে, তোমাদের অতিথিদের হক আছে, তোমাদের জান-প্রাণের হক আছে, তোমাদের চোখেরও হক আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত হচ্ছে ঐসব হক প্রতিপালন, ঐগুলিকে পরিহার করা নয়। ঐসব হক পরিত্যাগ করে কেবল ছালাত-ছিয়ামে ব্যস্ত থাকা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনা- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে অবহিত করা হলো যে, আমি বলে

৮. বুখারী, তিরমিযী হা/২৪১৫; ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নববী (৬৩১-৬৭৬হি.), রিয়াযুছ ছালেহীন (দামেশক : মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১৩শ প্রকাশ, ১৯৯৪খ্রী./১৪১৪হি.), পৃ. ৭৭।

থাকি, আল্লাহ্‌র শপথ! যতদিন জীবিত থাকব ততদিন আমি ছিয়াম পালন করব এবং রাতে ছালাত আদায় করতে থাকব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাক? আমি বললাম, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি ঠিকই একথা বলেছি। তিনি বললেন, তুমি তা করতে সক্ষম হবে না, কাজেই ছিয়ামও পালন কর, আবার ছিয়াম ছেড়েও দাও। তেমনি নিদ্রাও যাও, আবার রাত জেগে ছালাতও পড়। আর প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন কর। কারণ সৎকাজে দশগুণ ছওয়াব পাওয়া যায় এবং এটা সর্বদা ছিয়াম পালনের সমতুল্য হবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি-সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন ছিয়াম পালন করবে এবং দু'দিন ছিয়াম ছেড়ে দিবে (ছিয়াম পালনে বিরত থাকবে)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন ছিয়াম পালন কর এবং একদিন ইফতার কর (ছিয়াম পালন থেকে বিরত থাক)। আর এটি হচ্ছে দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম। এটাই হচ্ছে ভারসাম্য পূর্ণ ছিয়াম। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, আর এটিই শ্রেষ্ঠ ছিয়াম। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি শক্তি রাখি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কোন শ্রেষ্ঠ ছিয়াম নেই। (আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বৃদ্ধ বয়সে বলতেন,) হায়! আমি যদি সে তিন দিনের ছিয়াম কবুল করে নিতাম, যার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় হতো। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে একদিন ছিয়াম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অর্থাৎ একদিন পর একদিন ছিয়াম পালন করা অতি কষ্টকর। আর মনও মানছে না যে, যে কাজ যুবক বয়সে আরম্ভ করেছি বৃদ্ধ বয়সে তা পরিত্যাগ করব।[৯]

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল আমর বলেন, আমি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতাম এবং প্রতি রাত্রে একবার খতম করতে চাইতাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রতিমাসে একবার কুরআন মাজীদ খতম কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে বিশ দিনে একবার খতম কর। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দশ দিনে খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে এক সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম কর এবং এর চেয়ে বেশি নয়। এভাবে আমি নিজেই কঠোরতা আরোপ করেছি এবং তা আমার উপর আরোপিত হয়েই গেছে। আর নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন, তুমি

৯. বুখারী, 'কিতাবুছ ছাওম', 'ছাওমুদ্দাহর' অনুচ্ছেদ, 'কিতাবুত তাহাজ্জুদ', 'ফাযায়েলুল কুরআন' অনুচ্ছেদ, 'বিবাহ 'অধ্যায়, মুসলিম হা/১১৫৯; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫০; 'মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৮-৭৯।

জানো না সম্ভবত তোমার বয়স দীর্ঘায়িত হবে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, নবী করীম (ছাঃ) যা বলেছিলেন, আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। কাজেই যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম তখন আমার আফসোস হলো, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম![১০]

মূলকথা হচ্ছে কুরআন মাজীদ শুধু তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু লোকেরা এটাকে খুব কামালিয়াত (পূর্ণতা) ভাবে যে, অমুক ব্যক্তি এক রাতে পূর্ণ কুরআন খতম করেছে। এছাড়া রামাযান মাসে শবীনা খতম করা হয়। আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, হাফেযদের তেলাওয়াতে মুক্তাদীদের কানে يَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُـــوْنَ (ইয়া'লামূনা তা'লামূনা) ছাড়া আর কিছু পৌঁছে না। তবুও একে বড় ইবাদত মনে করা হয়। এটা দ্বীনের ক্ষেত্রে গুলূ বা বাড়াবাড়ি। যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। শবীনা খতম যা কুরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে করা হয়। যেমন একজন ক্বারী এসে কিছুক্ষণ তেলাওয়াত করে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন আসে। খেল-তামাশার মত মানুষ প্রত্যেক ক্বারীর তেলাওয়াত শ্রবণ করে আর বিচার করে কার তেলাওয়াত সুন্দর, জোরদার এবং হৃদয় আকর্ষণকারী বা হৃদয়গ্রাহী। তারা প্রত্যেক ক্বারীকে নম্বর দিয়ে থাকে কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয় ইত্যাদি। এটা কি দ্বীন? মিসরের ক্বারী আব্দুল বাসেত যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন শ্রোতারা এমনভাবে চিৎকার করত যেরূপ কবিরা কবিতা আবৃত্তি করলে করা হয়। কুরআন মাজীদে এসেছে,

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

'(ঈমানদারদের অবস্থা হচ্ছে) যখন তাদের নিকট কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের হৃদয়-মন প্রকম্পিত হয়। তাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

ঐসব অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াতকে কবিতা আবৃত্তির মত করা হয়। যেখানে মানুষ কেবল সুর বিচার করে, মর্ম ও অর্থের প্রতি খেয়াল করে না। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে ঐসব লোকদেরকে ক্বারী বলা হতো যারা কুরআনুল কারীমের আলেম হতো। অথচ আজকাল তাদেরকেও ক্বারী বলা হয় যে, কুরআনের কিছুই জানে না; বরং কুরআন

১০. রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫০; 'মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৮-৭৯।

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কিন্তু কেবল কণ্ঠনালী থেকে ح (হা) উচ্চারণ করতে সক্ষম। সে যুগ ও বর্তমান যুগের মাঝে কত ব্যবধান! বর্তমানে এরূপ হাফেযে কুরআনও সৃষ্টি হচ্ছে না। ঐশ্বর্যশালী ও সচ্ছল লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে হেফয পড়ায় না এজন্যে যে, ৪ বছর লেগে যাবে। আমাদের দৃষ্টিতে ক্বিরআত, তাজবীদ ও হেফযেরও স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। আরবী ভাষাও শিক্ষা করা উচিত, যাতে যা পড়বে তা অনুধাবনে সক্ষম হয়। উল্লিখিত কতিপয় উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, দ্বীন, তাকওয়া ও ইবাদতের ক্ষেত্রে গুলূ বা বাড়াবাড়ি দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আর এর মাধ্যমে বিদ'আতের দ্বার ক্রমান্বয়ে কিভাবে উন্মুক্ত হয়।

ব্যক্তিত্বে গূলু বা বাড়াবাড়ি

গুলূর দ্বিতীয় প্রকার غلو في الشخصيات অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে গুলূ বা সীমালংঘন। যে ব্যক্তি দ্বীনের খেদমত করে তাকে যথোপযুক্ত সম্মান করতে হবে। কিন্তু তার সম্মান ও মর্যাদা সীমাহীন বৃদ্ধি করে দেয়া ভুল। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁদেরকে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদার চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সীমালংঘন। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বানিয়ে দিয়েছিল। আর তারা বলত, আল্লাহ তিনজন- ১. পিতা অর্থাৎ আল্লাহ, ২. আল্লাহ্র পুত্র অর্থাৎ ঈসা (আঃ), ৩. রূহুল কুদস (জিবরীল)। তাদের নিকট পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদস এই তিনজন মিলে একজন। এভাবে তারা গুলূর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। এজন্য কুরআন মাজীদে নাছারাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ.

'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। আর আল্লাহ্র ব্যাপারে সত্য ছাড়া বল না' *(নিসা ৪/১৭১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ঐ প্রকার গুলূ বা বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে বলেন, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، 'তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না'। (অর্থাৎ আমার জাত-সত্তা, আমার মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন কর না) যেরূপ নাছারারা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছিল। আমি কেবল

আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১১] তিনি আরো বলেছেন, لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، 'তোমরা আমার কবরকে উপাসনালয়ে পরিণত কর না'।[১২]

নাছারারা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল আর ইহুদীরা তাদের কর্মকাণ্ডে তাফরীত (শৈথিল্য) করেছিল। তারা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে এমন অশোভন শব্দ প্রয়োগ করেছিল যা মুখে উচ্চারণ করাও অসম্ভব। তাঁকে তারা একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিল না। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন যেমন গোনাহ, তেমনি শৈথিল্য প্রদর্শনও গোনাহ।

নবীগণের পরে দ্বিতীয় স্তরে আছেন ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়ত। যাঁদের মধ্যে আলী ও ফাতিমা (রাঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ব্যাপারে একদল ইফরাত বা বাড়াবাড়ি করে, আরেক দল তাফরীত তথা শৈথিল্য ও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। শী'আদের নিকট আলী (রাঃ) বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী। এমনকি তাদের নিকট আলী (রাঃ) আল্লাহ্র সমমর্যাদায় অভিষিক্ত। পক্ষান্তরে খারিজীরা তাদের ব্যতিক্রম। তারা বলে, আলী কাফের (নাঊযুবিল্লাহ)। অপরদিকে শী'আরা বাড়াবাড়ি করে বলে, আলী (রাঃ)-এর স্থান অনেক ঊর্ধ্বে এবং তাঁর নিকট সব জিনিস বিদ্যমান। একটি আরবী কবিতায় আহলে বায়তের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لِيْ خَمْسَةٌ إِطْفِئْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة

অর্থাৎ (নাছারাদের নিকট তিনজন প্রভু থাকলেও) আমার আছে পাঁচজন। কঠিন বিপদ ও মুছীবতের সময় তাদের নাম নিয়ে বিপদ দূর করা হয়, রোগ আরোগ্য হয়। এই পাঁচজন হচ্ছেন- আল-মুছতফা মুহাম্মাদ (ছাঃ), আলী মুরতাযা (রাঃ), তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন এবং ফাতিমা (রাঃ)।

এই গুলূ বা বাড়াবাড়ি প্রতিহত করতে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

---

১১. বুখারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রী./১৪১৯হি.), হা/৩৪৪৫, 'নবীদের ঘটনা' অনুচ্ছেদ, পৃ. ১২২৮।

১২. মুওয়াত্ত্বা, আহমাদ, মিশকাত হা/৭৫০ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০; অন্য হাদীছে এসেছে, لا تجعلوا قبري عيداً 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত করো না'। দ্র. ছহীহ আবু দাউদ, হা/১৭৯৬; নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২৬ 'নবীর উপরে দরূদ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; তিনি আরো বলেন, لا تتخذوا بيتي عيدًا 'তোমরা আমার গৃহকে তীর্থ কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করো না' দ্র. আবু দাউদ, হা/২০৪২, হাদীছ ছহীহ। -*অনুবাদক।*

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ.

‘হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সত্য বিষয় ছাড়া কোন কথা বল না’ *(নিসা ৪/১৭১)*।

ইফরাত বা বাড়াবাড়ি এবং তাফরীত বা শৈথিল্য এতদুভয়ের মধ্যে হচ্ছে ন্যায়নীতির রাস্তা ও মধ্যপন্থা। যেটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত হচ্ছেন যারা কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল মানেন এবং সকল ছাহাবায়ে কেরামকে সম্মান করেন। প্রত্যেককে তার যথাযোগ্য সম্মান-মর্যাদায় তথা স্থানে সমাসীন করেন। তারা কারো প্রশংসায় সীমালংঘন করেন না, কাউকে অপমান-অপদস্তও করেন না।

সুন্নাত অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা। আর জামা‘আত দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে, যাঁদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে,

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ.

‘মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী এবং অবশিষ্ট উম্মতের মধ্যে যেসব লোক একনিষ্ঠতার সাথে তাদের অনুসরণ করে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্র প্রতিও তারা সন্তুষ্ট’ *(তাওবা ৯/১০০)*।

সুতরাং জামা‘আত বলতে ঐ সকল মুসলমান উদ্দেশ্য যাদের আক্বীদা হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের সবাই ইয্যত ও সম্মানের যোগ্য। তাঁরা নিষ্পাপ নন, তবে তাঁদের সৎকর্ম বা নেকী আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু তাঁদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের সৎকাজ প্রাধান্য পেয়েছে বা বিজয়ী হয়েছে। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, إِنَّ يَوْمًا شَهِدَهُ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كُلِّهَا أَوْ كَمَا قَالَ، ‘মু‘আবিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে যে একদিন অতিবাহিত করেছেন তা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সারা জীবনের চেয়ে উত্তম’।

আল্লামা ইবনু কাছীর স্বীয় اختصار في علوم الحديث (ইখতিছার ফী উলূমিল হাদীছ) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এ উক্তি উল্লেখ করেছেন। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয

নিঃসন্দেহে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন। কিন্তু ছাহাবী ছিলেন না, তিনি তাবেঈ ছিলেন। মু‘আবিয়া (রাঃ) ছিলেন ছাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর ত্রুটি হয়েছিল কিন্তু তাঁর সৎকর্ম ছিল অনেক। তাঁর কিছু ইজতেহাদী ভুল হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তাঁকে অপমানিত করা যাবে না। এটাই আহলে বায়ত ও ছাহাবায়ে কেরামের যথাযথ স্থান। আহলে বায়ত ও ছাহাবাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকতে হবে, শৈথিল্য থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের পরে তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয়, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছগণের স্তর। তাঁদের ব্যাপারেও মানুষ গুলূ বা বাড়াবাড়ির শিকার হয়। কোন কোন লোক মনে করে আমাদের অমুক বুযর্গ ব্যক্তি যা বলেন সব ঠিক, তার মধ্যে কোন তারতম্য, পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) সবাই আবশ্যিকভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের ব্যাপারে বেয়াদবী করা, তাঁদের প্রতি ভুল কথা আরোপ করা বড় গোনাহের কাজ। তাঁরা সবাই দ্বীনের প্রকৃত সেবক। উম্মতের মহা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁদের অসম্মান হয় এমন কোন কথা তাঁদের প্রতি আরোপ করা অনুচিত, অশোভন ও ভুল। তবে হ্যাঁ, তাঁদেরকে নিষ্পাপ গণ্য করা যাবে না। কিন্তু নিষ্পাপ গণ্য না করেই তাঁদের সম্মান ও ইয্যত করা আবশ্যিক। তাঁদের ভালবাসা অথবা ঘৃণা করার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা উভয়ই ভুল। এজন্যে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُوْنُواْ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيْرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواْ وَإِنْ تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত’ *(নিসা ৩/১৩৫)*।

অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُوْنُواْ قَوَّامِيْنَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান করবে না, সুবিচার করবে। এটাই আল্লাহ্ভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

ঘৃণা বা শত্রুতা এবং মুহাব্বত-ভালবাসা উভয় ক্ষেত্রে গুলূ বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। মানুষ সীমা লংঘন করে ফেলে। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অতি ভক্ত প্রেমিক ছিল। এটাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সে তাঁর প্রশংসায় এ হাদীছ রচনা করে দিল যে, سِرَاجُ أُمَّتِيْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ 'আমার উম্মতের প্রদীপ হচ্ছে আবু হানীফা'। এটা সর্বৈব মিথ্যা, বানোয়াট হাদীছ। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী[১৩] লিখেছেন, 'এ হাদীছ ছহীহ নয়; সম্পূর্ণ বানোয়াট, মনগড়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ কোন কথা বলেননি'।

ঐ ব্যক্তির ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর প্রতি ঘৃণা ছিল। সুতরাং ইমাম শাফেঈ সম্পর্কে সে এ হাদীছ তৈরী করে ফেলল, سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَشَدُّ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ إِبْلِيْسَ– 'আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি জন্ম নেবে, যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (ইমাম শাফেঈর নাম)। সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীস অপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে'।

ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে, ভালবাসায় ও অশ্রদ্ধায় এই সীমালংঘন মানুষকে ধবংস করে দেয়, দ্বীনের আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন, لاَ تَدَعْ قَبْرًا مُشَرَّفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ مَحَوْيْتَهُ– 'উঁচু কবর দেখলে তা যমীনের সাথে মিশিয়ে দিবে এবং কোন ছবি দেখলে তা মিটিয়ে দিবে'।[১৪]

ছবিও ব্যক্তিপূজার অন্যতম মাধ্যম। মুদ্রা ও অন্যান্য বস্তুর উপর অভিজাত, উত্তম ব্যক্তিদের ছবি মুদ্রণ বা অংকন ব্যক্তিপূজার নিদর্শন। কখনো যদি ঘোষণা করা হয় যে,

১৩. তাঁর আসল নাম আলী, পিতার নাম সুলতান মুহাম্মাদ, কুনিয়াত বা উপনাম আবুল হাসান, উপাধি নূরুদ্দীন। তিনি খুরাসানের হিরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে ১৮টি। তন্মধ্যে মিশকাতের ভাষ্য 'মিরকাতুল মাফাতীহ' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর লিখিত আরো ১১৭টি গ্রন্থ রয়েছে, যা প্রকাশিত হয়নি। তিনি ১০১৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। -*অনুবাদক।*

১৪. মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ হা/২০৩১, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৯৬।

অমুক ব্যক্তির ছবি এসেছে, তাহলে মানুষ সম্মান ও শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন ঐ ব্যক্তি জীবিত। কোন কোন স্থানে কর্তাব্যক্তি বা প্রধান ব্যক্তির চেয়ারে শীর্ষ স্থানীয় কোন ব্যক্তির ছবি রাখা হয়। ভাবখান এমন যেন ছবিই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছে। এজন্য বড় ব্যক্তিদের ছবি প্রকাশ ও মুদ্রণ মহা ফিৎনা। জনৈক ব্যক্তি তার প্রিয় পছন্দনীয় এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ছবি কুরআন মাজীদের মধ্যে রেখেছিল। সুতরাং শরী'আত ঐসব জিনিস রাখা ও সংরক্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তিপূজার জীবাণু মুসলিম জীবন যাত্রায় অনুপ্রবেশ করে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। জনৈক ধর্মভীরু লোক লিখেছেন, আমি নিষ্প্রয়োজনে কোন শিশুর ছবি তোলাও হারাম মনে করি। কেননা হতে পারে ঐ শিশুটি বড় হয়ে শীর্ষস্থানীয় কোন নেতা হয়ে গেল, আর তার ছবি নিয়ে শুরু হলো পূজা। আজ থেকে ৪০ বৎসর পূর্বের কথা। ভারতের বেনারসে এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মহাত্মা গান্ধীর বিশাল উচুঁ নয়নাভিরাম দীর্ঘকায় ছবি স্থাপন করা হয়। আমি দেখেছি সেখানে আগত প্রত্যাগত মুসলিম, অমুসলিম সবাই যখন ঐ ছবির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন হাত জোড় করে নমস্কার করে, অভিবাদন জানায়। এটাই যেন ছবির মর্যাদা, মাহাত্ম্য। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে, إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ. 'তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না' *(ফাতির ৩৫/১৪)*।

মোটকথা আম্বিয়ায়ে কেরাম, ছাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে ইযামের ব্যাপারে গুলূ, সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা হারাম। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর শানে বেয়াদবী করছিল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর رفع الملام عن الأئمة الأعلام (রাফ'উল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম) গ্রন্থটি পড়, তোমার দৃষ্টি উন্মীলিত হবে।

বর্তমানে দলাদলি-ফির্কাবন্দী ও দলপূজা সমাজে বিশাল অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, সঊদী আরব এ থেকে এখনো নিরাপদ আছে। সম্ভবত অন্যান্য আরব দেশও ঐ ফির্কাবন্দী, দলবাজি থেকে নিরাপদ। সঊদী আরবের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে মসজিদের ইমাম হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী যে মাযহাবের অনুসারী হোক না কেন মূল ইমাম না থাকলে যে কেউ ছালাত পড়িয়ে দেয়, সে যে তরীকার অনুসারীই হোক না? সেখানে এরূপ নেই যে, মসজিদ যে তরীকার লোকদের দখলে

ইমাম সেই তরীকার অনুসারী হতে হবে। সেখানে ইমামতির জন্য হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী এবং আহলেহাদীছের কোন বিশেষত্ব নেই। প্রত্যেক তরীকার ইমামদের পশ্চাতে ছালাত আদায় করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি এবং মামলা-মোকাদ্দমার ঘটনাও সংঘটিত হয়। মুক্তাদীদের মাঝে এই কল্পনা শুরু হয় যে, অমুক ব্যক্তি সামনে গেছে তার পিছনে আমার ছালাত হবে কি না।

সুনান আবু দাউদে ওছমান (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) তাঁর কতিপয় সাথীদের সঙ্গে বললেন, ওছমান (রাঃ) মক্কা ও মদীনায় ছালাত কছর করেননি। যদিও তিনি হজ্জের জন্য এসেছিলেন, তিনি মুসাফির ছিলেন। আর এমতাবস্থায় কছর না করা সুন্নাতের পরিপন্থী। কিন্তু ওছমান (রাঃ) যখন যোহরের ছালাত চার রাকা'আত পড়ালেন, তখন তাঁর পিছনে ইবনু মাসউদ (রাঃ) ছালাত আদায় করলেন। কেউ বললেন, আপনিতো বলেছিলেন যে, ওছমান (রাঃ)-এর ছালাত সুন্নাত পরিপন্থী। আবার আপনি তাঁর পিছনে ছালাত পড়লেন? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, اَلْخِلاَفُ شَرٌّ 'বিরোধিতা খারাপ'।[১৫]

আসলে ওছমান (রাঃ) ভাবতেন, আমি যেহেতু এখানে বিবাহ করেছি সেহেতু আমি মুসাফির নই এবং কছর করা যাবে না। এজন্য তিনি চার রাকা'আত পড়তেন। অন্যরা তাঁর এই ব্যাখ্যায় একমত ছিলেন না এবং বলতেন যে, তিনি দু'রাকা'আতের স্থলে চার রাকা'আত কেন পড়েন? বিষয়টি ছিল ব্যাখ্যাগত পার্থক্য।

তাবীলের অর্থ হচ্ছে আয়াত বা হাদীছের মর্মার্থ নির্ধারণ করা। যদি তাবীলে কারো কোন ভুল হয় কিংবা বুঝতে ভুল হয় তাহলে তাবীলকারীকে কাফির বলা যাবে না এবং তার পিছনে ছালাত হয়ে যাবে। হানাফীদের ছালাত শাফেঈদের পিছনে, শাফেঈদের ছালাত হানাফীদের পিছনে, আহলেহাদীছদের ছালাত মুকাল্লিদদের পিছনে অথবা বলা যায় যে, গায়র মুকাল্লিদদের ছালাত মুকাল্লিদদের পিছনে এবং মুকাল্লিদদের ছালাত গায়র মুকাল্লিদদের পিছনে আদায় হয়ে যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষ যখন গুলূ বা বাড়াবাড়ির শিকার হয়, তখন গায়র মুকাল্লিদ বলে যে, হানাফীর পিছনে ছালাত হবে না। কারণ সে মুকাল্লিদ, আর তাকলীদ করা শিরক। সুতরাং মুশরিকের পিছনে কিভাবে ছালাত হবে? অন্যদিকে মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলবে যে, তাকলীদ করা ফরয, আহলেহাদীছ যেহেতু তাক্বলীদ করে না, সেহেতু তার পিছনে ছালাত হবে না। সুতরাং

১৫. আবু দাউদ হা/১৯৬০ 'কিতাবুল মানাসিক', 'মিনায় ছালাত' অনুচ্ছেদ।

হানাফী, আহলেহাদীছ কেউ কারো পিছনে ছালাত আদায় করে না। বস্তুতঃ এই মাসআলা অতি ব্যাপক। এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা অবলম্বন ও ফৎওয়াবাযী করা সমীচীন নয়।

আমাদের দেশের কথিত কিছু সালাফী হানাফীদের পিছনে ছালাত আদায় করে না, তারা মুকাল্লিদ বলে। কিন্তু মক্কা ও মদীনায় হাম্বলী ইমামের পিছনে তারা ছালাত পড়ে, যদিও হাম্বলীও মুকাল্লিদ। তবে কোন কোন ব্যক্তি এমনও আছেন যারা বলেন যে, হাম্বলীও যেহেতু মুকাল্লিদ, তাই তার পিছনে আমরা ছালাত পড়ব না। আবার যদিও পড়ি তাহলে তা পুনরায় পড়ব। কত দুঃখজনক কথা! এরই নাম দলতন্ত্র, ফির্কাবন্দী বা দলপূজা। এ ব্যাপারে গুলূ বা সীমালংঘন করা হচ্ছে মধ্যপন্থা ও ন্যায়নীতির পথ অতিক্রম করা, শরী'আতের দৃষ্টিতে যা কোনক্রমেই নন্দিত ও পছন্দনীয় নয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন باب إمامة المفتون والمبتدع 'ফিৎনায় নিমজ্জিত ব্যক্তি ও বিদ'আতী ব্যক্তির পিছনে ছালাত' শিরোনামে। এতে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, قال الحسن البصري صَلِّ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ، 'ইমাম হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করো। আর বিদ'আতের গোনাহ তার (বিদ'আতীর উপর) উপর বর্তাবে'। ওছমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন তখন তাঁর নিকট খবর আসল যে, আপনাকে তো বিদ্রোহীরা অবরোধ করে রেখেছে, فَيُصَلِّى لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ 'ফিৎনায় নিমজ্জিত ইমাম কি আমাদের ছালাত পড়াবে? (মসজিদে নববীতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে আমরা কি ছালাত আদায় করব?) আমরা কি তাদের পিছনে ছালাত পড়ে নিব? ওছামান (রাঃ) কতই না উত্তম জবাব দিলেন, তিনি বললেন, إِنَّ الصَّلَوةَ خَيْرٌ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنُوْا مَعَهُمْ، فَإِذَا أَسَاؤُوْا فَاجْتَنِبُوْا إِسَاءَتَهُمْ، 'মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে ছালাত সর্বোত্তম। সুতরাং যখন মানুষ উত্তম কাজ করবে তখন তোমরা তাদের সাথে উত্তম কাজ করবে। অর্থাৎ যদি তারা ছালাত পড়ে, তাদের সাথে ছালাত পড়বে। আর যদি গর্হিত কাজ করে তাহলে সেই গর্হিত-খারাপ কাজকে পরিহার করবে'।

চিন্তা করা প্রয়োজন যে, খোলাফায়ে রাশিদুনের তৃতীয় খলীফাকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। এতবড় অপরাধের পরেও ওছমান (রাঃ) বললেন, যদিও ইমাম বিদ্রোহী তবু তার পিছনে তোমরা ছালাত আদায় করে নাও। এ ধরনের উদাহরণ একান্ত যরূরী। এসময়ে নাস্তিক্য, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ সহ অন্যান্য ফিৎনার সয়লাব

চলছে। অথচ আমরা সরবে আমীন বলা[১৬] ও রাফ'উল ইয়াদাইনের মাসআলা নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করছি। এক দল বলছে, রাফ'উল ইয়াদাইন আবশ্যিক, এটা ছাড়া ছালাত হবে না। অন্য দল বলছে, রাফ'উল ইয়াদাইন করছে, না মাছি মারছে? উভয় দলই ভ্রান্ত নীতির উপর বিদ্যমান। যারা রাফ'উল ইয়াদাইন করে তারা এটা সুন্নাত জেনেই করে। আর যারা করে না তাদের নিকটও কোন দলীল রয়েছে, যদিও অন্যরা বলে যে, ঐ দলীল দুর্বল।[১৭]

শাহ ইসমাঈল শহীদ স্বীয় تنوير العينين في سنة رفـــع اليـــدين (তানবীরুল আইনাইন ফী সুন্নাতি রাফউল ইয়াদাইন) গ্রন্থে লিখেছেন, 'যারা রাফ'উল ইয়াদাইনকে মানসূখ (রহিত) বলে, তারা ভুল বলে। কিন্তু কেউ যদি রাফ'উল ইয়াদাইন না করে তাহলে তার

১৬. সরবে আমীন বলা সুন্নাত। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন। দ্র. দারাকুতনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯; আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫; ইমাম যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে 'আমীন' বলতেন। আত্বা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) সরবে আমীন বলতেন। তাঁর সাথে মুক্তাদীদের আমীন-এর আওয়াযে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। দ্র. বুখারী, তা'লীক্ব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭; মুওয়াত্ত্বা, 'ছালাত' অধ্যায় হা/৪৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর কারণে'। দ্র. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৫৭৪; আত-তারগীব হা/৫১২; রাওযাতুন নাদিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; তাবারানী, নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; উল্লেখ্য যে, 'আমীন' বলার সপক্ষে ১৭টি হাদীছ এসেছে। দ্র. রাওযাতুন নাদিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১। -অনুবাদক।

১৭. রাফ'উল ইয়াদাইন ছালাতের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা প্রদর্শন করা অনুচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছালাতে সর্বদা রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন। এ সম্পর্কে কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করা হলো। রাফ'উল ইয়াদাইন করতে হবে মর্মে কুতুবুস সিত্তাহ তথা বুখারী (১ম খণ্ড, পৃ. ১০২), মুসলিম (১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮), আবু দাউদ (১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪, ১০৬), নাসাঈ (১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭), তিরমিযী (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫), ইবনু মাজাহ (পৃ. ৬২), দারাকুতনী পৃ. ১০৯; বায়হাক্বী ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪ ও ইবনু খুযায়মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩, ২৯৪-৯৬ হাদীছ এসেছে। ১. আশারায়ে মুবাশশারাহ বা দুনিয়াতে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবীসহ মোট ৫০ জন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দ্র. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ফৎহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮। ২. রুকুর পূর্বে ও পরে হাত উঠানোর হাদীছ ও আছারের সংখ্যা ৪০০। দ্র. মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাহ (মিসর : ১২৯৫হি.), পৃ. ৯। ৩. ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু আবদিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃত ২৩৪ হি.) বলেন, মহানবী (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহের মূলে মুসলমানের হক হচ্ছে রুকূতে যাওয়ার সময় ও পরে কান পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করা। ৪. ইমাম সুয়ূতী ও মোল্লা মঈন ইবনু আমীন (হানাফী) তদ্বীয় গ্রন্থে রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীছকে মুতাওয়াতির বলে মন্তব্য করেছেন। দ্র. আদ-দিরাসাতুল লাবীব, ৫ম দিরাসাহ, পৃ. ১৭০; তুহফাতুল আহওয়াযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০, ১০৬। ৫. ভারতের প্রখ্যাত বিদ্বান মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (হানাফী) বলেছেন, রাফ'উল ইয়াদাইন-এর হাদীছ মুতাওয়াতির। কারণ উহার বর্ণনাকারী ৫০ জন ছাহাবী। দ্র. যাফরুল আমানী, পৃ. ১৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; ফৎহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮। তিনি আরো বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীছের এমন বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় না। এর বর্ণনাকারী আশারায়ে মুবাশশারাহ। দ্র. ঐ, যাফরুল আমানী, পৃ. ২০; বিস্তারিত দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ৫১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৬৫-৬৮। *-অনুবাদক।*

ছালাত হয়ে যাবে। فـــان تركـــه أبـــدًا 'যদিও চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে'। কেউ হয়তো বলতে পারে যে, আমরা শাহ ইসমাঈল শহীদের মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) নই। কিন্তু তারা যদি ইসমাঈল শহীদ উপস্থাপিত উদাহরণ ও দলীল সমূহ ধীর-স্থির মন নিয়ে চিন্তা করে তাহলে মতবিরোধপূর্ণ ঐ মাসআলাগুলিতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে সক্ষম হবেন। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। এখানে দ্বীনের মধ্যে কিভাবে গুলূ (সীমালংঘন) সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনাই উদ্দেশ্য।

দ্বীনের মধ্যে গুলূ বা সীমালংঘনের এক তরতাজা উদাহরণ হচ্ছে ১৪০০ সালের মুহাররম মাসে মক্কা মুকাররমার হারাম অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনা। যাদের কারণে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় তারা বাহ্যত ছিল মুত্তাক্বী, ধার্মিক, তাপস ও সৎ লোক। তারা বাহ্যত তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রেমিক ছিল। কিন্তু তারা ন্যায়নীতির সীমা বা মধ্যপন্থার সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা এতই বাড়াবাড়ি করেছিল যে, বায়তুল্লাহ্‌কে অপদস্ত করে ফেলেছিল, ইসলামী নিদর্শনকে ধ্বংস করেছিল। মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে নিরপরাধ লোক নিহত হয়েছিল। অথচ হারাম শরীফ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে, وَمَن دَخَلَهُ كَـــانَ آمِنًـــا 'যে হারামের মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَـــرًا فَلْيُغَيِّـــرْهُ بِيَـــدِهِ، 'তোমাদের কেউ কোন গর্হিত কাজ দেখলে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে'।[১৮] এ হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐসব লোক বলল, গর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করেছে তা প্রতিহত করা দরকার। প্রথমে যবান দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল না হওয়ায় তারা চিন্তা করল যে, এখন হাত দ্বারা প্রতিহত করতে হবে, অর্থাৎ আক্রমণ করতে হবে, আগ্রাসন চালাতে হবে।

ঐ সময় কিছু লোক স্বপ্ন দেখতে শুরু করল যে, অমুক ব্যক্তি ইমাম মাহদী। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মাদ' ও তার পিতার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ'। তার কপালও ছিল প্রশস্ত এবং দেহের রং ছিল গৌরবর্ণ। তারা বলতে আরম্ভ করল যে, সুনান আবু দাউদে ইমাম মাহদীর যেসব নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, সেসব তার মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং ইনিই ইমাম মাহদী। অথচ এই দিকে লক্ষ্য নেই যে, ঐ কতিপয় নিদর্শন ব্যতীত ইমাম মাহদীর আরো অনেক নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। বরং তাদের উদ্দিষ্ট কতিপয় নিদর্শনের প্রতিই তারা লক্ষ্য করল। ঐ মুহাম্মাদের হবু বধু স্বপ্নে দেখল যে, তার হবু স্বামী ইমাম মাহদী হবেন। তার স্বপ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো, শুরু হলো জনশ্রুতি

১৮. ছহীহ মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায় হা/৪৯।

(লোকাচার)। ইমাম মাহদীর এক বিশেষ নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি মাকামে ইবরাহীম ও হাতীম-এর মাঝে বসে মুসলমানদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন। এজন্য তারা ইমাম মাহদীর আগমনের দাবী করার লক্ষ্যে অতি প্রত্যুষে মক্কায় উপনীত হলো। তারা এটা চিন্তা করল না যে, কোন মুসলিম বাদশাহ বা শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ততক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ বরং হারাম, যতক্ষণ তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফরী পরিলক্ষিত না হয় (مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا)।[১৯] এরপরও প্রথমে তাদের নিকট গিয়ে তাবলীগ তথা দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে হবে মৌখিকভাবে, তাদের উত্তমরূপে বুঝাতে হবে। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ, তাও আবার হারামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে! এটাতো সীমালংঘন। এর ফল কি হলো? সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের দুর্নাম, বদনাম ছড়িয়ে গেল। মুসলিম বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। অমুসলিমরা খুশি হলো যে, এটাই ইসলাম! এটা দ্বীনে গুলূ বা সীমালংঘনের এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ।

বাকী থাকল ইমাম মাহদীর ব্যাপার। তার ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে গুলূ বা বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হয়েছে। এক দল ইমাম মাহদীর আগমন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। আর তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে মওযূ হাদীছ বর্ণনা করে যে, لَا مَهْدِيْ إِلَّا عِيْسَى 'হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন মাহদী নেই'। তাদের বিপরীতে অন্য দল বলে যে, আমরা যাকে ইচ্ছা মাহদী বানাব। দুই একটি নিদর্শন কারো মাঝে দেখেই তারা তাকে মাহদী বানিয়ে নেয়। উভয় দলই ভ্রান্ত। ইমাম মাহদী যথাসময়ে আসবেন। সে সময় এমন হবে না যে, কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গী হবে (আর বাকীরা বিরোধী হবে)। বরং উম্মতের সবাই তাঁর সাথে থাকবে।

আমরা মক্কা মুকাররমার ঘটনা বর্ণনা করছিলাম। উচিত ছিল যে, মানুষ প্রথমতঃ শায়খ বিন বায[২০]সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমরা এরূপ

১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬।

২০. সঊদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী, ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ছহীহ বুখারীর হাফেয ও ফাৎহুল বারীর স্বনামধন্য ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি, সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের প্রধাণ, অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও উদার চরিত্রের অধিকারী, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র নিরলস খাদেম হিসাবে সর্বমহলে সমাদৃত, মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম বিরোধী নানা চক্রান্তের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সেনানী, কুসংস্কার ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন মুজাহিদ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায ১৩৩০ হিজরীর ১২ যিলহজ্জ মোতাবিক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সঊদী আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশেই তিনি শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকলেও ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর চোখে রোগ দেখা দেয়, দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৩৫০ হিজরীর মুহাররম মাসে ২০ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি ১৩৫৭-১৩৭১ হিজরী পর্যন্ত রিয়াদের আল-খারাজ এলাকার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদস্থ 'রিয়াদ মা'হাদ ইলমী'তে, ১৩৭৩ হিজরীতে 'শরী'আহ কলেজে' অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। ১৩৮১ হিজরীতে মদীনা

স্বপ্ন দেখেছি। আমাদেরকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে বলুন, তাঁর প্রকৃত ঘটনা কি? বর্তমান অবস্থায় আমাদের করণীয় বা কি? কিন্তু তারা নিজেরাই মুফতী হয়ে গেল, বিচারক হয়ে গেল, আর নিজেরাই আক্রমণকারী বনে গেল। যুলুম-অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। কত হাজীর রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত হলো। এই দুঃখজনক ঘটনার পরে ঐ হামলাকারীদের ব্যাপারেও সীমালংঘন প্রকাশ পেল। এক দল তাদের প্রতি ভালবাসায় সীমালংঘন করে বলল, তারা খুব সৎকর্মশীল লোক ছিল। তারা অত্যন্ত ভাল কাজ করেছিল। তারা সবাই হক্বের পথে শহীদ হয়েছে। অপর দল বলছে, তারা সবাই মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), প্রকৃত কাফির এবং জাহান্নামী। উভয় দলই গুলূ (বাড়াবাড়ি)-এর শিকার এবং বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ওছমান (রাঃ) তাঁর গৃহ অবরোধকারী বিদ্রোহীদেরকে কাফির বলেননি; বরং তিনি তাঁর সাথীদের বলেছেন, ফিৎনায় নিপতিত ইমামের পিছনে ছালাত পড়ে নাও। অনুরূপভাবে খারিজীরা যখন আলী (রাঃ)-এর বিরোধিতা করে বেরিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, যদি ঐসব লোক যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আক্রমণ করলে শক্তভাবে তাদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু যদি তারা পলায়ন করে, তাহলে তাদের স্ত্রীদের বন্দী করবে না এবং তাদের সম্পদ হস্তগত করবে না' (সেগুলির ক্ষতি সাধন করবে না)।

এসব উদাহরণ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলাম মানব প্রকৃতিতে মিতাচার, সংযম পয়দা করে, সকল ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। কোন গোনাহ সেটা যে পর্যায়ের হোক না কেন, তাকে যথাস্থানে রাখতে হবে। তদ্রূপ নেকী সেটা যে পর্যায়ের হোক তাকে তার যথোপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এই পন্থা অবলম্বনে মুক্তি পাওয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন এবং ১৩৯০ সালে চ্যান্সেলর পদে উন্নীত হন। ১৩৯৫ হিজরীতে সউদী আরবের দারুল ইফতার প্রধান এবং ১৪১৪ হিজরীতে সঊদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালের ১২ মে বুধবার দিবাগত রাত ৩-টায় ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি কতিপয় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ১. আল-ফাওয়ায়েদুল জালিয়া ফিল মাবাহিছিল ফারযিয়াহ, ২. মাসায়েল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ, ৩. আত-তাহযীরু মিনাল বিদা', ৪. রিসালাতানে মু'জিযাতানে আনিয যাকাতে ওয়াছ ছাওম আল-আক্বীদাতুছ ছাহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা, ৫. উজূবুল আমল বি সুন্নাতির রাসূল (ছাঃ), ৭. আদ-দাওয়াতু ইলাল্লাহি ওয়া আখলাকুদ দু'আত, ৮. উজূবু তাহকীমি শার'ইল্লাহি ওয়া নাবযুহামা খালাফাহূ, ৯. হুকমুস সুফুর ওয়াল হিজাব ওয়া নিকাহুশ শিগার, ১০. আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবঃ দাওয়াতুহূ ওয়া সীরাতুহূ, ১১. ছালাছু রাসাইল ফিছ ছালাহ, ১২. হুকমুল ইসলাম ফী মান ত্ব'আনা ফিল কুরআন ওয়া রাসূলিল্লাহহি (ছাঃ), ১৩. হাশিয়াতুন মুফীদাতুন 'আলা ফাৎহিল বারী, ১৪. ইক্বামাতুল বারাহীনা আলা হুকমি মান ইছতাগাছা বিগায়রিল্লাহ, ১৫. ছিদকুল কুহানাহ ওয়াল 'আর্রাফীনা, ১৬. আল-জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ, ১৭. আদ-দুরূসুল মুহিম্মাহ লি'আম্মাতিল উম্মাহ, ১৮. ফাতাওয়া তাতা'আল্লাকু বি-আহকামিল হাজ্জ ওয়াল ওমরাতে ওয়ায যিয়ারাহ, ১৯. উজূবু লুযূমিস সুন্নাহ ওয়াল হাযরে মিনাল বিদ'আহ, ২০ নাকদুল ক্বাওমিয়াতিল আরাবিয়াহ, ২১. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাউওয়া'আহ। -*অনুবাদক।*

সম্ভব, সম্ভব ইসলামী বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা। যদি মুস্তাহাবকে ফরয অথবা ওয়াজিব গণ্য করে মুসলমানদেরকে কাফির বানানো আরম্ভ করা হয় এবং কাফিরদেরকে মুসলিম বানানোর স্থলে মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার করতে থাকলে সবকিছু উলট-পালট হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে যেমন এসেছে আমাদের অবস্থাতো তদ্রূপ হওয়া উচিত ছিল। আল্লাহ বলেন, مُّحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْـــوَانًا. 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাদেরকে রুকূও সিজদারত দেখবেন' *(ফাতাহ ৪৮/২৯)*। উক্ত আয়াতে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের অবস্থা কিরূপ তা বর্ণিত হয়েছে। তাদের তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে-

১. তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর। কাফিররা তাদেরকে সহজ-সরল এবং নরম ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী বুঝতে পারবে না। তারা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে অতি দৃঢ়। তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে কেউ অঙ্গুলি নির্দেশের ক্ষমতা রাখে না।

২. তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। একটু চিন্তা করা দরকার যে, আমরা একে অপরের প্রতি দয়ার্দ্র কি-না? আর এই সহানুভূতি কেন? বলা হচ্ছে-

৩. তোমরা তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় পাবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে থাকে। এ কারণেই তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল।

আমাদের দেশে মসজিদকে ঝগড়া-বিবাদের স্থলে পরিণত করা হয়েছে, কতনা দুঃখজনক ঘটনা। কোন মাসআলা সম্পর্কে সামান্যতম মতানৈক্য হলেই ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি শুরু হয়ে যায়।

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির আরেকটি লক্ষণীয় ঘটনা উপস্থাপন করব। সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী জনৈক ব্যক্তি জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত অবস্থায় বা বেখেয়ালে তিনি বাম হাত দ্বারা ইশারা করলেন। যদিও ডান হাত দ্বারা ইশারা করাই সুন্নাত। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ঐ বেখেয়ালে কৃত ভুলের জন্য এ বলে চলে গেল যে, খত্বীব ছাহেব সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করেছে। তার পিছনে ছালাত পড়া জায়েয নয়।

আরেকটি উদাহরণ, উর্দূ ভাষার জনৈক সাহিত্যিক ও কবি এক আলেমে দ্বীনের নিকটে গেলেন। ঘটনাক্রমে এসময় তার পাজামা টাখনুর নীচে ছিল। ঐ আলেম ব্যক্তি সাহিত্যিকের পায়ের নিকটে বসে তার পাজামা নিজ হাতে উচুঁ করতে লাগলেন।

সাহিত্যিক যখন দেখলেন যে, এত বড় বিশিষ্ট আলিম আমার পদপ্রান্তে উপবেশন করে একাজ করছে, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জাবনত হলেন। এরপর আর কোন দিন তিনি ঐ আলিমের নিকটে যাননি। জ্ঞানীসুলভ পদ্ধতি ছিল উত্তম ব্যবহার ও সুন্দর কথার মাধ্যমে তাকে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া। এঘটনাটিও গুলূ বা বাড়াবাড়ির একটি দৃষ্টান্ত।[২১]

ঐ আলিমের বাড়াবাড়ির আরেকটি উদাহরণ, দেশীয় নির্বাচনের সময় এক ব্যবসায়ী তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমার এক বন্ধু অমুক এলাকায় প্রার্থী। আমি কি তার ক্যানভাস বা প্রচারাভিযানের জন্য নর্তকীদের নিকটে যেতে পারি? ব্যবসায়ী নিজেও সুন্নাতের অনুসারী ছিল। সে প্রশ্ন করার পর বলল, মাওলানা (জনাব) আমার বন্ধুর বিপক্ষে যে ব্যক্তি প্রার্থী হয়েছে, সে ফাসিক ও ফাজির (পাপাচারী) এবং মদ্যপায়ী। যদি সে বিজয়ী হয় তাহলে অত্যন্ত খারাপ ও অশ্লীলতা সৃষ্টি হবে। এরপর আলিমে দ্বীন উত্তর দিলেন যে, হ্যাঁ তুমি প্রচারাভিযানের জন্য নর্তকীদের নিকট যেতে পার। দেখলেন তো? পাজামা টাখনুর সামান্য নিচে নেমে গেছে দেখে নিজ হাতে তা তুলে দিয়েছেন। আর এখানে নর্তকীদের গৃহে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এক দিকে সীমাহীন বাড়াবাড়ি অপর দিকে অসীম শৈথিল্য।

ইফরাত ও তাফরীত তথা বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন ও শৈথিল্যের পথ রুদ্ধ করে যতক্ষণ ন্যায়নীতি ও মধ্যপন্থা অনুসরণ করা না হবে, ততক্ষণ আমাদের জীবনে প্রকৃত, খাঁটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْـــنِكُمْ 'দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না' *(নিসা ৪/১৭১)*। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৎকাজ করার তাওফীক্ব দিন এবং আমাদের গোনাহ ক্ষমা করুন-আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

২১. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করতে ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটা সুন্নাত পরিপন্থী আমল। এর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে, অহংকার বশত কাপড় (টখনুর নীচে) ঝুলিয়ে পরিধান করে'। দ্র. বুখারী, মুসলিম হা/২০৮৫, ২০৮৭; আবু দাউদ হা/৪০৮৫; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৭৯১-৯২; তিনি আরো বলেন, 'কাপড়ের যতটুকু টাখনুর নীচে ঝুলে যাবে, ততটুকু জাহান্নামে যাবে'। দ্র. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৯৩, পৃ. ২৭৬। -*অনুবাদক।*